**উপন্যাস**

**মস্কোর বরফবিথী ও একজন সুতপা**

**পর্ব-১০**

সালটা ১৯৮৮।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রোনাল্ড রিগ্যান মস্কো সফর করেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে চলছে পরিবর্তনের ঘূর্ণি হাওয়া। বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তিম কাল। প্রায় চার দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলছিল। এক ভয়ানক সময় ছিলো বিশ্ববাসীর জন্য। দুই পরাশক্তি দেশের -যুদ্ধংদেহী অবস্থা। উভয় পক্ষই নিজের অবস্থানে ছিলো অনড়। একটুও ছাড় দিতে নারাজ।

রিগ্যানের সফরের উদ্দেশ্য ছিল এই অচলাবস্থা ভাঙা। অস্থিরতা কমানো এবং দুই দেশের মধ্যে সংলাপ চালু করা। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তার ছিলো কঠোর অবস্থান। সেইসাথে লাতিন আমেরিকা ও আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন ছিলো জোড়ালো। তাই রিগানের রাষ্ট্রপতি থাকা কালিন সময় মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। যাকে বলে দা-কুমড়া সম্পর্ক। সেই সময়টা ছিলো স্নায়ু যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ানক একটি সময়। অনেকে যুদ্ধের অনিবার্যতাকে নিয়ে ভাবতো। তাই কুটনৈতিক সমাধান অতি জরুরী হয়ে পড়ে। রিগ্যানের মস্কো সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনার অগ্রগতি। ১৯৮৩ সাল থেকে মতবিরোধের কারণে স্থগিত ছিল। তার সফরের সময়, তিনি এবং সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ মানবাধিকার বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন যেমন ধর্মের স্বাধীনতা এবং রাশিয়া থেকে দেশত্যাগ করতে ইহুদিদের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা সহ আরো বেশ কয়েকটি ইস্যুতে।

তবে বলা যায়, রিগ্যান তার সফরকে গর্বাচেভের সাথে দেখা করার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। গর্বাচেভের সংস্কারবাদী নীতিকে তিনি সমর্থন দিয়েছিলেন । বুঝতে পেরেছিলেন যে এর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তাদের দেশের মধ্যে উন্নত সম্পর্কের তৈরী হবে। শুধু তাই নয়। গর্বাচেভের পেরেস্ত্রইকা আর গ্লাসনস্তের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের দিকে যাবে। সমাজতান্ত্রিক ভাবনা থকে একদিন ভেঙ্গে যাওয়া রাষ্ট্রগুলো পশ্চিমা পুঁজিতন্ত্রে পা বাড়াবে। এতে পুঁজিবাদের জয়। আমেরিকার জয়।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। তিনি গর্বাচেভের সাথে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস, আমেরিকান এবং রাশিয়ানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধির চুক্তি সহ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সুচনা করলেন এক নতুন অধ্যায়ের। শুরু হলো নতুন দিনের গল্প- সেই সময় পেট্রিস লুমুম্বার কলাভবনে বা হোস্টেলের টিভি রুমে এই সব নিয়ে চলতো হৈচৈ। অপুর্ব সহ আরো অনেকেই টিভির দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতো। হাবিজাবি আলোচনা। গরম গরম কথাবার্তা। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখার বুলি। কমরেডদের চোখে মুখে নতুন মেকঅ্যাপ, নতুন চাল-চলন। বলনে কহনে নতুন ভাষা। যা আগে কেউ শুনেনি।

অপুর্ব প্রথম যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে আসে ১৯৮৭ সালে তখন সব কিছুই ছিলো অন্যরকম। মানুষগুলোর ছিলো ভলোলাগার, ভালোবাসার। কি সুন্দর পরিপাটি লাগতো সব কিছু। রেডিও, টিভি, সিনেমায়, সভা সেমিনারে বাজতো কোরাস- “

*“We Shall Overcome, we shall overcome We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome someday.”*

কিন্তু বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন, সব অমঙ্গলকে পরাস্থ করার প্রতিজ্ঞা যে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মস্কো সফরের সাথে শেষ হয়ে যাবে সেদিন কেউ বুঝতে পারেনি।

সেই থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হলো দিন বদলের পালা। পরিস্কার নীল আকাশে দেখা দিলো কালো মেঘের আনাগোনা।

ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করলো পুরো সমাজটাকে কালো অন্ধকার। মানুষরূপী শকুনিরা ভীড় করতে শুরু করলো যত্র তত্র। এই সালটাই যেন সোভিয়েত ভাঙ্গনের প্রথম চিহ্ন। এক কালো অধ্যায়। গর্ভাচভ সেই ভাঙ্গনের খলনায়ক। নিজের হাতেই এই পরাশক্তির দেশটির সর্বনাশ ডেকে আনলেন, সাঁজালেন জ্বলন্ত চিতা। আর সেই আগুনে সমাজতান্তিক ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে ভস্ম হয়ে গেলো। কেউ টেরও পেলনা। সকলেই যেন সন্মোহিত। সাধারন জনগন বুঝতেও পারেনি যে পরিবর্তনের ঠেলায় তাঁদের জীবন, দর্শন ঘর-গেরস্থালী সব ভেস্তে যাবে কচুরি পানার মতো কোন এক অজানা অনিশ্চয়তার দিকে।

তবে সেটা সকলের জন্য না।

অনেকের ভাবনায় আবার নতুন স্বপ্নেরা পেখম মেলছে। পরিবর্তন যেন আশির্বাদের করস্পর্শ। লুটে- পুটে খাওয়ার ধান্ধায় ছিলো অনেকে। পলিট ব্যুরোর অনেকেই রাতারাতি বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেলো। প্রাইভেটাইজেশনের দোহাই দিয়ে বড়ো বড়ো সরকারী ফ্যাক্টরী, প্রতিষ্ঠান, নাম মাত্র দামে কিনে নেয়।

সারা দেশ যেন বেশ্যাবৃত্তিতে ছেয়ে গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

মেয়েদের ঠোঁটে-মুখে রঙীন প্রলেপ। টু-পাইস কামাচ্ছে শরীরটাকে অন্যের কাছে ছেড়ে দিয়ে।

সাধারন মানুষ চলছে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার ধান্ধায়।

ধীরে ধীরে দুর্বৃত্যায়নের কালো চাদরে ঢেকে গেলো পুরো সমাজটা। যে শিক্ষকদেরকে নিয়ে অপুর্ব একসময় খুব গর্ব করতো তাদেরকে নিয়ে ভাবলে লজ্জা হতে শুরু করলে। মানুষের বিবেক, সততা কতো ভঙ্গুর, আপেক্ষিক। আমাদের জীবন যেন পরিস্থিতির দাস। সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। শিক্ষকরাও অসৎ উপায় বেছে নিতে বাধ্য হলো। ক্লাশে না গেলেও কোন অসুবিধা নেই, পড়াশুনা না করলেও পরীক্ষায় পাস করা যায়। শুধু শিক্ষকদেরকে একটু খুশী রাখতে হবে। ডিপার্টমেন্টে দুএকবার অসৎভাবে ঢু মারতে হবে। তা হলেই জীবনের স্পন্দনে কোন ছেদ পরবে না। যতো পারো বিদেশে যাও, ব্যাবসা করো - ক্ষতি নেই তাতে।

শুধু অপুর্বরা আছে বিপদে।

ওদের মতো বোকারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। শুধু পড়াশুনা করে কোন কালে কী কচু হয়েছে? যারা পড়াশুনা করছে না, ক্লাশে যাচ্ছে না, আইনস্টাইন, নিউটন, মার্ধাকর্ষন শক্তি, পরমানু, রেডিও ফিজিক্সের কোন কিছুই জানে না, কিছু জিজ্ঞেস করলেই একটা একটা করে মাথার চুল ছিড়ে, তারাও একদিন ডিগ্রীর সার্টিফিকেট পাবে, গাউন পড়ে গ্র্যাজুয়েশনে সামিল হবে, অর্ধচাঁদ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হবে।

বাড়ীতে চিঠি লিখবে-আপনাদের সকলের আশির্বাদে আমি ভালোভাবে পাস করেছি। হবে আনন্দে গদ-গদ। লম্ফ-ঝম্ফে ব্যাস্ত রাখবে আশে পাশের সবাইকে। পাড়লে তত্ব কথাও শুনাবে-ইচ্ছে করলেই সব কিছু হয়।

ভালো মানুষেরাই যেন সমাজের বোঝা, অবাঞ্চিত।

শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের শত্রুতার অবসান ঘটে। গর্বাচেভ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সংবিধান প্রজাতন্ত্র বিলুপ্ত করে। এক মহা সুনামী যেন দেশটার উপর দিয়ে বয়ে গেলো। ভেঙ্গে পনের টুকরো হয়ে গেলো দেশটা। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে অপুর্ব খুব কষ্ট পেয়েছিলো। তার মতো অনেকেই মন খারাপ করেছিলো। দেশটকে ভালোবাসতো বলেই ভবিতব্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতো।

তার শিক্ষক নাদিয়জদা দিমিত্রভনাকে কতোদিন কাঁদতে দেখেছে। প্রায় সময়ই দুচোখ ছল ছল করতো।

শুরু হলো রাশিয়ান রুবেলের পতন এবং সাথে সাথে হাইপারইনফ্লেশন। এই দুয়ের যাঁতাকলে রাশিয়ার অর্থনীতিতে নেমে আসে আমূল পরিবর্তন। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে, ৭৪ বছর অস্তিত্বের পর, সোভিয়েত ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে অস্তিত্বের অন্ত যায়। বিশ্ব জুড়ে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিতে একটি নাটকীয় পরিবর্তনের যেন জোয়ার বয়ে গেলো। ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েত রাশিয়ায় শুরু হয় মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দা। এক অস্থিতিশীর সামাজিক পরিস্থিতি। রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি থেকে ধপ করে উচ্চ বেকারত্ব এবং পঙ্গু মুদ্রাস্ফীতি সহ অর্থনৈতিকভাবে বিপদ সীমায় চলে যায়। যেন একটি পঙ্গু হ-য-ব-র-ল রাষ্ট্র।

আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি।

শুধুমাত্র ১৯৯১ সালে, দ্রব্য-পন্যের দাম ২০০০ শতাংশ বাড়ে, অনেক রাশিয়ান তাদের স্ফীত মূল্যের কারণে খাদ্য বা পোশাকের মতো মৌলিক পণ্য কিনতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মজুরী বৃদ্ধি পায়নি বলে সমাজে দরিদ্রতা বেড়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ব্যর্থ হলো। উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাত্রা ছাড়াও, এই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে। যার কারণ মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রাক্তন প্রজাতন্ত্রগুলির বিলুপ্তির পরে পাওনা পরিশোধের জন্য। পরবর্তীকালে জিডিপিতে একটি বড় ধরনের পতন ঘটে।

হঠাৎ টুং টাং করে ফ্লাটের কলিং বেল এর আওয়াজ অপুর্বর কানে এলো।

ভাবনায় ছেদ পড়লো। বুঝতে পারেনি কখন গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসেছে। দাদা ফ্লাটে না থাকলেও সেখানে দু বন্ধু সেতু আর মজিদকে পেয়ে গেলো। মজিদ সোফাতে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন। সেতুই দরজা খুলে দিলো।

অপুর্বকে দেখে সেতু যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিস্ময়তার তুঙ্গে-

-কিরে, তুই এখানে কী করে? তোর না রুস্তভ যাওয়ার কথা? এ কয়দিন কই ছিলি? কোন কিছু হয় নাই তো?

-আরে থাম থাম। এক সাথে এতো প্রশ্ন করলে উত্তর দেই কেমনে?

-তু কিতা আবোল তাবোল কস? আগে বল তুই মস্কোতে কা?

-কারন আমি তো মস্কোতেই আছি। রুস্তভ যাই নাই ত। সুতপা, মস্কোতে আইছে, তাই যাওয়া হয় নি।

এই কথা শুনে মজিদ আড়মোড়া দিয়ে ঘুম থেকে ধরমর করে জেগে উঠলো। চোখের পাতাগুলো তখনো আধা লেপ্টে।

-আরে, দোস্ত বলছিস কী? সত্যি তা?

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো সেতু। এক নাগারে বকাবাদ্য শুরু করলো।

-শালা! পরশু আইছে, অথচ তুই একটা খবরও দিলি না। একটা ফোন করস নাই কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি

-বস, ভালো রান্না হইছে। খাইয়া যাইস।

-না না, আমি কিছু খাইতাম না। বরং একটু চা খাই ।

শেষ পর্যন্ত সেতুকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজ বিকেলে সুতপাকে ওর ফ্লাটে নিয়ে আসার প্রতিশ্রতি দিয়ে সোজা নিজের রুমে ফিরে আসে। মাসুদ থেকে যায়। দাদার সাথে দেখা করে আসবে। বিশেষ কাজটা শেষ করে আসবে।

সুতপা তখনো আসেনি।

অপুর্ব ভাবলো হয়তো নাসরিনের সাথে ঘুরছে। রুমে একা একা মন বসছিল না।

শেষ পর্যন্ত কবি ফরহাদ ভাইয়ের ৭নম্বর ব্লকে এলো। রুমেই ছিলো। অনেকক্ষন ধরে চললো খোশগপ্পো।

দুপুরের রৌদ্র আস্তে আস্তে নরম হতে শুরু করলো। মনটা কেমন যেন অস্থির। মাথায় চিন্তার মাছিগুলো ভন ভন করছে সারাক্ষন।

অপুর্ব এবার নিজের ব্লকের দিকে রওনা দিলো।

পথেই দেখা হলো বন্ধু সাইফুল আর তার বান্ধবী কুমুর সাথে। কুমুর ওখানেই সুতপাকে রেখে এসেছিলো প্রথম রাত্রে। কুমুই

অপুর্বকে জিজ্ঞেস করলো-

-সুতপা কোথায় অপুর্ব দা?

-আমার সাথে তো ওর দেখাই হয় নি? সম্ভবত নাসরিনের সাথে ঘুরছে-অপুর্ব উত্তর দিলো।

অথচ পরে অপুর্ব জানতে পারলো সাড়াটা দিন ওর সাথে নাসরিনের দেখাই নাই। কেমন মেয়ে ও। বলছিলো সুতপাকে অপুর্বর রুমে নিয়ে আসবে-তাও করেনি। ও কেমন আছে, কোথায় আছে, খাচ্ছে কি খাচ্ছে না তারও কোন খোঁজ খবর নিচ্ছে না।

অপুর্ব ভেবেছিলে দ্বিতীয় রাতে সুতপা নাসরিনের রুমেই ছিল, ওখানেই ঘুময়েছিল। অথচ পরে বুঝতে পারলো সে বরং কুমুর

ওখানেই ছিলো। তবে সে রাত্রে কুমু নিজের রুমে ছিলো না। সুতপাকে রেখে ও ওর এক বান্ধবীর কাছে চলে যায়।

সাড়াটা দিন সে আর এদিকে আসেনি।

বেশ খারাপ লাগল অপুর্বর।

সুতপা বলেছিলো আজ সকালে দেখা হবে, অথচ সাড়াটা দিন কেটে গেল, কোন হদিস নেই। আসার নাম গন্ধও নেই।

নাসরিনের উপর বেশ রাগ হলো অপুর্বর। ওই মেয়েটা হয়তো ওকে কোথায় কোথায় ঘুরাচ্ছে।

আজ দুপুরে ওর এক বন্ধু তালাতের ওখানে ওর নিমন্ত্রন ছিলো। গিয়েছে কিনা তাও জানে না। অপুর্বর ওখানে যাওয়ার কথা

ছিল। রাগ করেই আর যায় নি।

বিকেলে একটু ঘুমুনোর চেষ্টা করলো।

ঠিক কাটায় কাটায় সন্ধ্যা ৭টায় ঘুম ভাঙ্গলো। হঠাৎ মাসুদ এসে ঘরে ঢুকলো।

-কি অপুর্ব, ঘুমালে নাকি? সুতপার সাথে দেখা হলো?

-ওখানে আর যাই নাই। ভালো লাগছিল না। তাই রুমে ফিইরা আইছি

-কিন্তু ওর কোন খবর পাইছস? কই আছে টাছে?

-খবর পাইছি, ও নাসরিনের লগে নাই। আজ বিকেলে ওর এক বন্ধুর ওখানে যাওয়ার কথা ছিলো। গেছে কিনা, তাও জানিনা।

আমারও যাওয়ার কথা ছিলো। যাই নাই।

-তা হলে, চল আমরা এখন যাই। দেখি কোথায় পাওয়া যায়। খোঁজ খবরতো নেওয়া উচিৎ। এইটা তো আমাদের দ্বায়িত্ব। অন্য

শহর থেকে একটা মেয়ে আসছে একা একা, ওর দেখাশুনা করা আমাদেরই কর্তব্য, তাছাড়া দেখছি তোর মনটা খারাপ-

-কি ঠিক বলছি না-বলেই একটা ফ্যাক করে হাসি দিলো।

এর মধ্যে তুহিন এলো।

তিনজনেই এক সাথে বেড়িয়ে পড়লো।

প্রথমে ৭নম্বর ব্লকে। সব মেডিসিনের ছাত্ররা এখানে থকে। ওখানে নাসরিনের সাথে দেখা হলো। কিন্তু কথা হয়নি।

সুতপা সেখানে নেই। একটু চিন্তা পড়ে গেলো ওরা তিন জন। পরে তুহিন বললো-চল ১০ নম্বর ব্লকে যাই। ওখানে থাকতে পারে।

-তুই কি করে বুঝলি সুতপা ওখানে থাকবে-অপুর্ব জিজ্ঞেস করে

-আরে, হ্যাঁ, অমলদা বলছিলো, এ কয়দিন নাকি রুস্তভের রহমান ভাই ওনার কাছেই ছিলো। আজ উনি রুস্তভ ফিরে যাচ্ছেন।

আমার বিশ্বাস ও ঐখানেই আছে।

-চল চল তাড়াতাড়ি যাই। রহমান ভাইয়ের সাথেই ও আলাপ-সালাপ করছে।

পরে বন্ধু অসীমের টানাটানিতে অপুদার রুমে মিষ্টি আর মিষ্টান্ন খেতে হলো।

ঐদিন ছিলো অপুদা আর রুমা আপার গায়ে হলুদ।

নীচ তলায় এক সিনিয়র ভাইয়ের রুমে হচ্ছে রুমা আপার গায়ে হলুদ আর উপরে চলছে অপুদার গায়ে হলুদ। বেশ জমেছে।

অনেকেই এসেছে। ২৮শে মার্চ ১৯৯০ ওদের বিয়ে।

মিষ্টি আর মিষ্টান্ন খেয়ে অপুর্ব কড়িডোরে এসে একটা সিগারেট ধরালো। সাথে আরো অনেকেই ছিলো।

সুতপা আর অপুর্বকে নিয়ে অনেক হাসি তামাসা চললো।

ঠিক সেই সময় বন্ধু সাইফুল এসে সুতপার অসুস্থতার খবরটা দিলো।

তাড়াতাড়ি মাসুদ আর তুহিনকে নিয়ে অপুর্ব ওর ঐখানে ছুটে চললো।

সত্যিই অসুস্থ। খুব জ্বর। গায়ের টেম্পারেচার প্রায় ৩৯। সারা মুখু ও হাতে এলর্জীর মতো বড়ো ভড়ো ফোসকা। ডাক্তার

ভাইয়েরা নাকি সন্দেহ পোষন করতে লাগলো হয়তো হাম। শেষ পর্যন্ত কেউ একজন ডাক্তারকে খবর দিলো।

১০ মিনিটের মধ্যেই আ্যাম্বুলেন্স সহ ডাক্তার এলো। সুতপা তখন বেশ কান্না-কাটি করছে।

ডাক্তার ওকে ভালো করে দেখলো। চিন্তার কোন কারন নেই বলে জানালো। হাসপাতালে নেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।

ডাক্তার কিছু ঔষধ দিয়ে গেলো।

সে রাতে কুমুকে নিয়ে সুতপা সুশীলদার রুমেই থেকে গেল। ৭নম্বর ব্লকে।

পরদিন সকালে অপুর্ব সুশীল দার রুমে যায়।

রুমে ঢুকেই দেখা হলো সিনিয়র মন্জু ভাইয়ের সাথে। সুতপাকে দেখতে এসেছে।

অপুর্বকে দেখে যেন স্বস্থির পেল। কিছুক্ষন পর মন্জু ভাই চলে যান।

সুতপা তখন ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে এসেছে। অপুর্ব রুমে গিয়ে বসলো।

-কেমন লাগছে, সুতপা?

-মাথা নেড়ে সাড়া দিলো, ভালো আছি

-জ্বরটা কমছে এখন?

-আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো

-কাল রাতে ঘুম হইছে?-অপুর্ব আবারো প্রশ্ন করলো

এবার আর মাথায় সায় না দিয়ে অস্ফুট সুরে বলো-

-আপনি কেমন আছেন?

-আমি ঠিক আছি।-আমি চায়ের কেটলিটা বসিয়ে দিয়েছি। আমি নীচের বুফে থেকে কিছু বিস্কিট নিয়ে আসছি-এই বলে অপুর্ব রুম থেকে বেড়িয়ে গেল।

সুতপার অসুস্থতা এখনো কাটেনি। এলার্জিগুলো যেন বেড়েছে। চোখে, কপালে ব্যাথা অনুভব করছে।

চা করলো অপুর্ব।

-নাও একটু চা বিস্কিট খাও

-আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না-সুতপার সোজা-সাপ্টা উত্তর।

-কিছু না খেলে যে শরীর দূর্বল লাগবে-একটু কিছু খাও-অপুর্ব ফের সাধলো।

-আমার ইচ্ছে করছে না।

হঠাৎ সুতপা কান্না শুরু করলো।

অপুর্ব ওর পাশে গিয়ে বসলো। মাথায় হাত রাখলো।

-না কান্ন-কাটি করে বরং একটু খেয়ে ঔষধটা খেয়ে নাও। আমরা সবাই তোমার পাশে আছি। দুএক দিনের মধ্যেই তুমি ঠিক

হয়ে যাবে-অপুর্ব ওকে সান্তনা দিলো।

শেষ পর্যন্ত কথা রক্ষার খাতিরে সামান্য একটু রুটি মুখে পুতে অতি কষ্টে যেন গিললো।

একসময় সুশীলদা এলেন।

ওনার রুম থেকে সুতপাকে নিয়ে অপুর্ব ওর রুমে নিয়ে এলো ২ নম্বর ব্লকে।

বিকেলে বন্ধু সেতু এলো। ওর পীড়াপীড়িতে সুতপাকে নিয়ে সেতুর ফ্লাটে গেলো।

**(চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট